গণতন্ত্রের প্রকৃতি (Nature of Democracy)

সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে এক বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকারের বিভিন্নরূপ আলোচনা প্রসঙ্গেই গণতন্ত্রের কথা বলা হয়। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা' হল গণতন্ত্রের সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র শাসনব্যবস্থার ধারণার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে এক মহৎ আদর্শে পরিণত হয়েছে। বর্তমানকালে 'গণতন্ত্র' শব্দটির দ্বারা এক বিশেষ সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, এমনকি এক বিশেষ অর্থব্যবস্থাকেও বোঝান হয়। অধ্যাপক গিডিংস এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "A Democracy may either be a form of government, a form of state; a form of society or a combination of all the three'। তবে গণতন্ত্রের অর্থ যাইহোক, সাম্য হল এর মূল ভিত্তি। সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য বর্তমান থাকলে যথাক্রমে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্রিক সমাজের(Democratic Society) সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সাম্যের ভিত্তিতে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্রিক সমাজ বলা হয়। এই সমাজব্যবস্থায় সকল ব্যক্তি সমমর্যাদাসম্পন্ন। সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারেও সমান অধিকার বর্তমান থাকে। এইরূপ সমাজে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণকে স্বীকার করা হয় না। জন্মগত ও ধনগত বৈষম্যকে এখানে মান্যতা দেওয়া হয় না। বলপ্রয়োগের কোন সুযোগ থাকে না। সমাজজীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সকলের প্রচেষ্টাকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। বার্নস গণতন্ত্র প্রসঙ্গে বলেন, 'আদর্শগত বিচারে গণতন্ত্র হল এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে সকল ব্যক্তি একই রকম না হলেও সকলেই সমান। অর্থাৎ প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ'।

গণতন্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বোঝায় যা সাম্যনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বর্তমান তাকে। জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রত্যেকে সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করে। এর ফলে গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের হাতেই চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার চূড়ান্ত অধিকারী বলে গণ্য হয়। ফরাসী দার্শনিক রুশো এই সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রকে গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। তাই বলা যায় গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রে শেষ পর্যন্ত জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সর্বময় অধিকারী। সেজন্য এক্ষেত্রে জনগণের শাসন (rule of the people) প্রতিষ্ঠিত থাকে। জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও কার দ্বারা শাসন পরিচালিত হবে এবিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার বা শাসনব্যবস্থা যে-কোন ধরনের হতে পারে। আর এই কারণে গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজতান্ত্রিক ও অভিজাততান্ত্রিক শাসনের সন্ধানও পাওয়া যায়।

গণতন্ত্রিক সরকার বা শাসনব্যবস্থা (Democratic Government) হল গণতন্ত্রের সংকীর্ণ অর্থ। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রবক্তারা গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। গণতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে বোঝায় জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে। তবে জনগণের দ্বারা সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই হল গণতন্ত্রিক সরকারের প্রকৃত বা আদিরূপ। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের ক্ষুদ্রাকৃতির নগর রাষ্ট্রগুলিতে এ ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্তমান ছিল। বর্তমানকালে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আয়তন ও লোকসংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিনিধিমূলক পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, গণতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অপরিহার্য। গণতন্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া গণতন্ত্রিক সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। কিন্তু গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

গণতন্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বময় কর্তৃত্ব জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকলেও শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব জনগণের হাতে ন্যস্ত নাও থাকতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে কোন রাজা বা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মুষ্টিমেয় প্রতিনিধিগণ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংলণ্ডের কথা বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডে জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং ইংলণ্ড হল একটি গণতন্ত্রিক রাষ্ট্র; কিন্তু শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক। কারণ শাসনব্যবস্থার শীর্ষে অধিষ্ঠিত থাকেন একজন রাজা বা রাণী। অথচ গণতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের দ্বারাই শাসনকার্য পরিচালিত হওয়ার কথা। তবে বর্তমান বৃহদায়তন এবং জনবহুল রাষ্ট্রে জনগণের প্রত্যক্ষ শাসনের পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রের মত কেবল 'জনগণের শাসন'(rule of the people) নয়, গণতন্ত্রিক সরকারের 'জনগণের দ্বারা শাসন'(rule by the people) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। সমাজতন্ত্রবাদীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। সমাজ থেকে যাবতীয় বৈষম্য ও শোষণের বিলোপ সাধন করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বা কাঠামোতে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যে সকল বিষয়ের কথা বলা হয় সেগুলি হল উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানা, সর্বসাধারণের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য উৎপাদন পরিচালনা, সকল রকম শোষণের অবসান, শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, ‘অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন’।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকের কাছে গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক আদর্শ বা রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়; এ হল একটি জীবনধারা বা জীবন-যাপন পদ্ধতি(way of life)। গণতান্ত্রিক জীবনধারা বলতে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণকে বোঝায়। গণতান্ত্রিক জীবন-যাপনের ভিত্তি হিসাবে গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর আস্থা, পাস্পরিক মত বিনিময় ও আলাপ-আলোচনার ওপর নির্ভরশীলতা, যে-কোন রকম বৈষম্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ, অপরের প্রতি সম্মানজনক আচরণ প্রভৃতির কথা বলা হয়। বলা হয় যে জীবন-যাপনের এই পদ্ধতি সকলে অনুসরণ করলে প্রত্যেকের স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হবে। গণতান্ত্রিক জীবনধারায় পারস্পরিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বলপ্রয়োগকে একেবারে অস্বীকার করা হয়।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ (Forms of Democratic Government)

গণতন্ত্রে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জনগণ শাসনকার্যে কিভাবে অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ জনগণ সরাসরি শাসনকার্য পরিচলনা করে অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে, তার ভিত্তিতে গণতন্ত্র দু-ধরনের হয় ঃ ক) বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Pure or Direct Democracy) খ) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)।

ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ঃ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হল বিশুদ্ধ গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রে জনগণ সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ রকম শাসনব্যবস্থায় জনগণই সরকারী যাবতীয় কাজ নিজেরাই সম্পাদন করে। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের নগর রাষ্ট্রগুলিতে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্ধারিত স্থানে মিলিত হয়ে আইন প্রনয়ণ করত, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করত, রাজস্ব ও ব্যায় নির্ধারণ করত, পররাষ্ট্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। এমনকি তারা বিচারবিভাগীয় কার্যাদিও সম্পাদন করত।

এইভাবে নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাই হল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। এ ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় দেশের সকল নাগরিক রাষ্ট্রকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। তাই এই শাসনব্যবস্থাকে অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রও বলে। নাগরিকরা আইন প্রণয়ন ও শাসন-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করার জন্য যে জায়গায় মিলিত হত এথেন্সে তাকে বলা হত ‘এক্লেসিয়া’ (Ecclesia of Athens) রোমে জায়গাটি ‘মিলিশিয়া’(Militia of Rome) পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও বিভিন্ন স্থানে বহু নগর-রাষ্ট্র ছিল।

তবে একথা বলা যায় যে, প্রাচীন গ্রীস বা এথেন্স বা ভারতবর্ষ যেখানেই হোক না কেন, এই নগর-রাষ্ট্রগুলি ছিল ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অল্প জনসংখ্যা বিশিষ্ট। তাই জনগণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার ব্যপারে কোন সমস্যা ছিল না। তখনকার দিনের সমস্যাও ছিল অত্যন্ত কম। আবার সহজ ও সরল প্রকৃতির সমস্যা। আর এই কারণে স্বল্প সংখ্যক জনগণ সহজে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বিশেষ সময়ে মিলিত হয়ে সমস্যাদির সমাধান ও রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রের আয়তন বিশাল, আবার জনসংখ্যাও বিপুল পরিমাণ। তাছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সমস্যাগুলিও বেশী, আবার জটিল প্রকৃতির।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি, শিল্পায়ন, নগরায়ন, জটিল আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আইনের সংখ্যা যেমন বহু, আবার আইনের প্রকৃতিও তেমনি জটিল। সাধারণ জনগণের পক্ষে দেশের প্রয়োজনীয় আইন প্রনণয়নে অংশগ্রহণ করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। এখন জনগণের দ্বারা সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনার কথা ভাবাই যায় না। আর এই কারণে বর্তমানে এই ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র পৃথিবীতে বিরল বলা যেতে পারে। সারা পৃথিবী খঁজে বেড়ালে দু-একটি ছোট ছোট দেশে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তার বেশী নয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুবিধা ঃ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেশ কিছু সুবিধা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এগুলি হল ঃ

১) গণতন্ত্র বলতে 'জনগণের শাসন'কে বোঝায়। এদিক থেকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা।

২) এ ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাতে করে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

৩) জনগণের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য এ ধরনের শাসন-ব্যস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তার ফলে সরকার বিপ্লব-বিদ্রোহ থেকে মুক্ত থাকে।

৪) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন হল সহজ ও সরল প্রকৃতির। কারণ এখানে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগীয় কাজকর্মের মধ্যে তেমন কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে না।

৫) অনেকের মতে এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় শ্রেণীবিরোধের সম্ভাবনা তেমন একটা থাকে না।

৬) সীমিত পরিমাণ জনসংখ্যা ও ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হল আদর্শ শাসনব্যস্থা।

৭) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

৮) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ব্যয়বাহুল্যের ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকে বলা যেতে পারে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অসুবিধা ঃ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নানা ধরনের সুবিধা থাকলেও বেশকিছু অসুবিধাও লক্ষ্য করা যায়।

১) বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট ও জন বহুল রাষ্ট্রের পক্ষে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা অনুপযোগী।

২) রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি সাধারণ নাগরিকদের থাকে না।

৩) এ ধরনের শাসনবাস্থায় বিশৃঙ্খলার ত্রুটিমুক্ত। তার ফলে জনস্বার্থের হানি ঘটার আশঙ্কা থাকে।

৪) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে কার্যত অল্প সংখ্যক জনগণই শাসনকার্য পরিচালনায় যোগ দেয়। তার ফলে গোষ্ঠী স্বার্থে শাসনকার্য পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৫) সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত বা অজ্ঞ হলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র নিকৃষ্টশ্রেণীর গণতন্ত্রে পরিণত হবে।

৬) এই ধরনের শাসনব্যবস্থা জরুরী অবস্থার উপযোগী নয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে দেশের সকল মানুষ মিলিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দেশের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে এভাবে দৃঢ় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

৭) সাধারণত জনগণ কোন বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। এই মতানৈক্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া শাসনকার্যে পরিলক্ষিত হয়।

৮) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে আইন, শাসন ও বিচার-বিভাগীয় কাজকর্মের মধ্যে তেমন সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে না। তার ফলে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

৯) আজকের দিনের জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কর্মমুখর শাসনব্যবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র উপযুক্ত বিবেচিত হয় না।

যদিও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নানা প্রকার অসুবিধা আমরা দেখতে পাই, তাহলেও যথার্থ গণতন্ত্র হিসাবে এর গুরুত্ব ও উপযোগিতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আর এই কারণে এখনকার পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলি সংরক্ষণের জন্য গণ-ভোট, গণ-উদ্দ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়।

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র

তত্ত্বের দিক থেকে গণতন্ত্র 'জনগণের শাসন' হলেও বর্তমান সারা বিশ্বের বৃহদায়তন জনবহুল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সকল জনগণের পক্ষে শাসনকার্যে অংগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর এজন্যই বিশ্বের বৃহদায়তন জনবহুল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিকল্পরূপে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের গণতন্ত্রে জনগণের সকলেই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে না। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রধিনিধিরাই রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এপ্রকার শাসন-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কালের জন্য, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের কাজকর্মের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন।

কোন জনপ্রতিনিধি যদি তার মেয়াদকালে জনস্বার্থবিরোধী কোন কর্মে লিপ্ত হন তাহলে তিনি জনগণের আস্থা থেকে বঞ্চিত হন এবং মেয়াদান্তে তাঁদের পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আর এভাবে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনস্বার্থ বহুল পরিমাণে সুরক্ষিত হতে পারে। পরোক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার আসলে জনমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকার, কেননা জনবিরোধী কাজকর্ম করলে সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দিক থেকে জনগণই হল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনমতকে এইভাবে চরমমূল্য দেওয়ার ফলে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সুরক্ষিত হতে পারে। কাজেই বলা যেতে পারে, তত্ত্বগত দিক থেকে বর্তমান এপ্রকার গণতান্ত্রিক সরকার এক আদর্শ সরকার।

পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যাতে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হতে না পারে তার জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাগীকরণ-ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক সরকারের কার্যাবলী আইনের দ্বারা পরিচালিত হয় বলে প্রত্যেক সরকারকে তিনপ্রকার কর্মের সাথে যুক্ত থাকতে হয়। যথা - আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধীয় (legislative), শাসন সম্বন্ধীয় (executive) ও বিচার সম্বন্ধীয় (judicial)। আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ একদল ব্যক্তি নতুন আইন রচনা করেন এবং পুরাতন আইন প্রয়োজন মত সংশোধন করেন।

যেমন, আয়কর (Income Tax) সম্বন্ধে নতুন আইন প্রবর্তন করা হয় এবং পুরাতন আইন সংশোধন করা হয়। শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সরকারের অর্ন্তগত কতিপয় ব্যক্তি ঐ সকল আইনকে যথাস্থানে প্রয়োগ করেন। যেমন, আয়কর সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে জনগণের কাছ থেকে ঐ কর আদায় করেন। বিচার সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ এক গোষ্ঠী ঐ সকল আইনের অর্থ ব্যাখ্যা করেন এবং বিতর্কিত কোন ক্ষত্রে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ঐ সকল আইন মান্য করছে অথবা করছে না তা নির্ধারণ করেন; আবার অমান্য করলে আইন লঙ্ঘনকারীর শাস্তির ব্যবস্থাও করেন।

ব্যক্তি স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী রাষ্ট্রবিদ্ মন্টেস্কু (Montesquieu) এপ্রকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের বা বিভাগীকরণের (mseparation of powers) প্রস্তব করেন। স্বাধীনতা ও সাম্যের সুরক্ষার জন্য বর্তমানকালের প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এপ্রকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এক স্বীকৃত ব্যবস্থা। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা দ্বারা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভোট ব্যবস্থা দ্বারা, জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন ব্যবস্থার দ্বারা, জনবিরোধী কার্য কলাপের জন্য কোন প্রতিনিধীকে পরবর্তী নির্বাচনে নির্বচিত না করার সুযোগের ব্যবস্থার দ্বারা, জনপ্রতিনিধিদের মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থার দ্বারা, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা পরোক্ষ গণতন্ত্র যাতে আদর্শভ্রষ্ট না হয়; এ সকল বিষয়ে সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই সবিশেষ লক্ষ্য রাখে।

সমালোচনা ঃ যদিও পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থাতে নানারকম সুবিধা আছে, কিন্তু তাহলেও নানারকম সমস্যাও পরিলক্ষিত হয়। এই শাসনব্যবস্থা এতই জটিল যে তার সঠিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। জনগণের অভিমত ব্যক্ত করার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, কিন্তু ঐ জনমত অনুসরণ করা প্রতিনিধিদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। আইন সভার কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হলে জনগণের প্রতিনিধিকে ঐ আলোচনার পূর্বে তাঁর নির্বাচক মণ্ডলীর অভিমত জানতে হয় এবং পরে আইন সভায় কেবল সে সকল জনমতেরই হুবহু উল্লেখ করতে হয়।

কিন্তু এইভাবে আইনসভার প্রতিটি আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে, জনসভা আহ্বান করে জনগণের অভিমত জানা প্রতিনিধিদের পক্ষে সর্বদা সম্ভব নয়। এজন্যই প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে, প্রতিনিধিদের বিচার-বুদ্ধি ও সততার ওপর নির্ভর করে এবং জনগণের স্বার্থ-চিন্তা করে অভিমত প্রকাশ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে এড্‌মন্ড বার্গ (Edmund Burke) রিপ্রেসেনটেটিভ (representative) ও ডেলিগেট (delegate) এর মধ্যে যে প্রকার পার্থক্যের কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে ডেলিগেট কেবল তার নির্বাচক মন্ডলীর অভিমতকেই হুবহু উল্লেখ করে, আর রিপ্রেসেনটেটিভ বা জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করা হয় তার স্বকীয় বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা মতামত দেওয়ার জন্য।

এখন সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি বার্ক প্রদত্ত ‘রিপ্রেসেনটেটিভ্’ অর্থে প্রতিনিধিত্ব করেন তাহলে, অধ্যাপক রাফেলের অভিযোগ হল, অধিকাংশ প্রতিনিধির মধ্যে ঐকমত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং সেই গণতান্ত্রিক সরকারকেও আর ‘জনগণের শাসন’ বা ‘অধিকাংশের শাসন’ বলা যায় না। ধরা যাক, আইন সভার কোন এক বিতর্কে ক ও খ ঐকমত্য পোষণ করেন, আবার অন্য কোন বিতর্কে তারা ভিন্নমত পোষণ করেন, কেননা তাঁরা উভয়েই তাঁদের বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন। এমন অবস্থায় আইনসভার গৃহীত সিদ্ধান্তটি অধিকাংশ জনগণের পচ্ছন্দ অনুসারে নাও হতে পারে।

আবার, বর্তমানের বহু-দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ প্রকার দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিনিধিরা যেমন উল্লিখিত অর্থে 'রিপ্রেসেনটেটিভ' নয়, তেমনি আবার 'ডেলিগেট'ও নয়, কারণ তারা যেমন তাদের নিজ নিজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি আবার হুবহু জনমতকেও উল্লেখ করতে পারে না। তারা প্রত্যেকে কেবল নিজ নিজ দলের কয়েকজনের অভিমতকেই ব্যক্ত করে। এমন ক্ষেত্রে, ঐ ইচ্ছা বা অভিমত অধিকাংশ জনগণের ইচ্ছা বা অভিমত নাও হতে পারে।

কাজেই তত্ত্বগতভাবে, পরোক্ষ গণতন্ত্র 'জনগণের সরকার'রূপে চিহ্নিত হলেও কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় না, মাত্র কতিপয়ের স্বার্থই সেখানে প্রাধান্য পায়।

গণতান্ত্রিক আদর্শ (Democratic Ideals)

‘গণতন্ত্র’ বলতে আমরা সাধারণত বিশেষ এক ধরনের রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝে থাকি। কিন্তু এটি একটি সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে ‘গণতন্ত্র’ বলতে এক বিশেষ রকমের সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ সমাজ ও তার বিভিন্ন সংগঠনের এক ধরনের শাসনব্যবস্থা। ‘গণতান্ত্রিক আদর্শ বলতে সাধারণত বোঝায় - সমাজ বা সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীর দ্বারা অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা গঠিত শাসনব্যবস্থা বা সরকার’।

গণতান্ত্রিক আদর্শের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল - ব্যক্তির বা নাগরিকের 'সর্বাধিক স্বাধীনতার সুযোগ', তবে একের স্বাধীনতা যেন অপরের স্বার্থ-বিরোধী না হয়।। সরকারের আইন অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছামতন বা পচ্ছন্দমতন আচার-আচরণের প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়। এমন ক্ষেত্রে মানুষের কর্ম-স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের অধিকাংশ চাহিদা অনুসারে যদি আইন প্রণীত হয় তাহলে সেইসব আইনের প্রতি অধিকাংশ মানুষেরর সমর্থন থাকে এবং তার স্বেচ্ছায় আইনগুলিকে অনুসরণ করে। এমন ক্ষেত্রে আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হয় না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অধিকাংশের চাহিদাকে অনুসরণ করে আইন প্রণীত হওয়ায় সেক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মূল্যবানরূপে গণ্য করা হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ আনুসারে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা, বাক্ ও কর্মের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয়; তবে ঐ স্বাধীনতা যেন অপরের স্বার্থ বিরোধী না হয়।

গণতান্ত্রিক আদর্শের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল - ‘সাম্য’(equality) অর্থাৎ সকল ব্যক্তি বা নাগরিককে সমমর্যাদা সম্পন্নরূপে গ্রহণ করা। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বাধীনতা’কে মূল্য দিলেও ‘সাম্য’কেও মূল্যবান বলতে হয়। স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষত পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তি সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে সমান মর্যদার পাত্র এবং তারা প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী - এমন সাম্য-নীতিই গণতান্ত্রিক আদর্শ।

গণতান্ত্রীদের ‘স্বাধীনতা’ ও ‘সাম্য’ কেবলমাত্র রাজনৈতিক আদর্শ নয়; সমাজের অপরাপর ক্ষেত্রে, যথা - শিক্ষা, জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীরা ‘স্বাধীনতা’ ও ‘সাম্য’কে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, উপার্জনের ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই সমান স্বাধীন এবং সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। গণতন্ত্রীরা বলেন, কেবল ভোট দানের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হবে না - তাদের বৃত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে, উপার্জনের ক্ষেত্রে, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের ক্ষেত্রেও সমান স্বাধীনতা ও সুযোগের ব্যবস্থা থাকবে। আদর্শগত বিচারে গণতন্ত্র হল এমন এক সমাজ বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি এক রকম না হলেও সমগ্রের (সমাজ বা রাষ্ট্রের) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে তারা সমান মর্যাদাসম্পন্ন। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে বংশগত, ধনগত ও শিক্ষাগত বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

‘স্বাধীনতা’ ও ‘সাম্যের’ মতো সৌভ্রাতৃত্বকেও গণতান্ত্রিক আদর্শরূপে গণ্য করা হয়। অবশ্য যে-কোন সামাজিক আদর্শের আবশ্যিক অঙ্গ হল ভ্রাতৃত্ববোধ। যে কোন প্রকার সামাজিক সংহতির ভিত্তিমূল হল - সাধারণের কল্যাণে সম-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির আত্মনিয়োগ। সখ্যতার বা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ না হলে সমাজের একজন অন্যজনের কল্যাণে, প্রত্যেক জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত হবে না এবং তার ফলে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য তাই জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ফরাসী বিপ্লবীরা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে (Liberty, Equality and Fraternity) রাজনৈতিক আদর্শরূপে গণ্য করেছেন।

অধ্যাপক রাফেল (Raphael) ‘ভ্রাতৃত্ব’ ও ‘স্বাধীনতা’র মধ্যে পার্থক্য করেছেন। রাফেলের মতে, ‘ভ্রাতৃত্বের’ প্রত্যয়টির সঙ্গে ‘সাধারণের দায়িত্ববোধ’ যুক্ত আর ‘স্বাধীনতা’ প্রত্যয়টি সঙ্গে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ যুক্ত। ভ্রাতৃত্ব বোধের জন্য গোষ্ঠী কল্যাণ সাধিত হয়; স্বাধীনতা ব্যক্তির আত্মবিকাশে সহায়তা করে। রাফেল আরো বলেন, সাম্যবাদী সমাজে ‘ভ্রাতৃত্বের ওপর এবং উদারপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজে ‘স্বাধীনতা’র ওপর অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) গণতান্ত্রিক আদর্শের দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই, স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। কর্মের স্বাধীনতা ব্যক্তির কাছে মূল্যবান হলেও তা রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের শাসনব্যস্থা। কিন্তু জনসাধারণের অধিকাংশ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, যাদের রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে কোন্ কাজটি ভাল আর কোন্ কাজটি মন্দ তা নির্ধারণ করার মত উন্নত বিচার-বুদ্ধি থাকে না। এমন ক্ষেত্রে জনগণের কর্মের স্বাধীনতা স্বীকর হলে তাতে রাষ্ট্র বা সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্লেটো ‘সাম্য’কেও স্বীকৃতি দেননি। প্লেটোর মতে, ‘সাম্য’কে শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করলে নাগরিকদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। সকল মানুষের মানসিক ও দৈহিক সামর্থ্য একরকম হয় না। কোন ব্যক্তি প্রখর বুদ্ধিমান, আবার কোন ব্যক্তি নির্বোধ; কোন ব্যক্তি দৈহিক বলে বলীয়ান, আবার কোন ব্যক্তি দুর্বল। কাজেই আদর্শ রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী তার বৃত্তি ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হওয়াই উচিত।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ